গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ১, সংখ্যা ১২
মে ২০২০

পরিবর্তন জীবনের রীতি, আর তাকে আমাদের মেনে নিতেই হয়। করোনার দ্বারা আক্রান্ত দুনিয়ায় আজ প্রায় সমস্ত জাতিই বিশাল বানিজ্যিক লোকসানের সম্মুখীন। ১৮৮৬ সালের ১লা মে যে শ্রমিকগোষ্ঠী একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই করে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণে সমর্থ হয়েছিলেন, আজ তাঁদের অনেক উত্তরসূরিই অনুভব করতে পারছেন যে, আগামী দিনে দৈনিক কাজের সময় বাড়াতেই হবে, তা না হলে অর্থনীতিকে তার স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। দেখা যাক, আগে কি হয়...

কলম হাতে

মালা মুখার্জী, সরজিত মণ্ডল, স্বাগতা পাঠক, ডাঃ অমিত চৌধুরী, শামসুদ্দিন শিশির, নাহার আলম, অনির্বাণ বিশ্বাস এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.:   লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

'গুঞ্জন'এর পথ চলা অনেক দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, সেই প্রাক ইতিকথন আমরা সকলেই গুঞ্জনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'দূরের জানালা' থেকে জেনেছি। তবে 'গুঞ্জন' ই-ম্যাগাজিন হিসাবে সকলের কাছে নতুনভাবে জনপ্রিয়তা ও সমাদর পেয়েছে বিগত বছরের জুন মাস থেকে। দেখতে দেখতে আমাদের সকলের প্রিয় 'গুঞ্জন' এক বছরের বর্ষপূর্তির একেবারে দোরগোড়ায়। এই এক বছরে আমাদের গুঞ্জনকে যাঁরা কবিতা, গল্প লেখনীতে মুখরিত ও মনোগ্রাহী করে তুলেছেন, তাঁদের সকলকে ঐকান্তিক ধন্যবাদ। এছাড়া যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে গুঞ্জনের প্রতিটি পৃষ্ঠার কবিতা বা গল্পের সাথে মেলবন্ধন রেখে রঙিন পটভূমি পরিকল্পনা করেন প্রত্যেক সংখ্যায়, তাঁদের এই নেপথ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকেও সাধুবাদ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা আশা করি আগামী বছরগুলোতেও সারা বিশ্বের গুনীমানী লেখক-লেখিকাদের কলমের ছোঁয়ায় 'গুঞ্জন' আরও অধিক রূপে সমাদৃত হবে।

বর্তমান পরিস্থিতি যে অতল আঁধারে আচ্ছন্ন আছে, সেই আঁধার কেটে নতুন আলোর দিশার সন্ধান যেন সারা বিশ্ব খুব তাড়াতাড়ি পায়, প্রত্যেকে আমরা সেই প্রার্থনাই করি।■

বিনীতা —

রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

কলম হাতে

প্রচ্ছদ চিত্রঃ গুঞ্জনের শিল্পী গোষ্ঠী

কলম হাতে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

(১১)

আজ দেওয়ালী, ১১ই নভেম্বর। আমরা মাঠ ঘাট পেড়িয়ে এগিয়ে চলেছি। এলাম সীতা রপতন গ্রামে বাল্মীকি আশ্রমে। আশ্রম লাগোয়া একটি দুর্গা মন্দির আছে। মহারাজ চা খাইয়ে পথের বিবরণ দিলেন। প্রায় দশ কিলোমিটার হেঁটে এলাম পূর্বা গ্রামে, এখানে সূর্যের তপস্থলী। সকাল দশটায় নর্মদায় স্নান করে নিলাম, আরো অনেকে করছে। এখানে সুরপন নদী নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, খুবই পবিত্র স্থান। একজন মৌনী বাবার আশীর্বাদ ও প্রসাদ নিয়ে আবার পথ চলা। আজই আমাদের পরিক্রমার শেষ দিন, মনটা কেন জানি না একটা যন্ত্রনায় ভরে গেল। রাস্তার দু'ধারে বাড়িগুলো নুতনভাবে সেজে উঠেছে, বহু মানুষ মা নর্মদার আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে আসছে। আমরা এগিয়ে চলেছি মহারাজপুরের দিকে। আধা শহরে অনেক দোকান আছে। এখানে নর্মদার সাথে বানজুর নদীর সঙ্গম হয়েছে। একটা দোকানে চা খেয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চললাম। কিন্তু একটা দৃশ্য মনকে খুব পীড়া দিল।

নদীর পাড়ে বেশ কিছু কম বয়সী ছেলে মদ খাচ্ছে, আর তাস

খেলছে। হিরার খনির সামনে বসে দিন শেষে ওরা শূন্য হাতে বাড়ি ফিরছে। বানজুর নদী পেরিয়ে মান্দালাতে এলাম। দু'পাশে প্রচুর দোকান। সবাই চাইছে তাদের দোকানে বাড়িতে যাই। আমরা মা নর্মদার আশীর্বাদ নিয়ে চলেছি বলে ওদের ধারণা। আরও আট কিলোমিটার হেঁটে সহস্রধারায় উমাদেবীর আশ্রমে পৌছালাম। দুপুর দুটো, আমাদের যাত্রা এবারের মত শেষ। আশ্রমের মাতাজী আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। কিন্তু একটি চিন্তার কথাও শোনালেন, কাল কোনো বাস চলবে না, তাই জব্বলপুর যাওয়া সমস্যা হবে। ...ক্রমশ ■

সনির্বন্ধ অনুরোধ

পাঠক-পাঠিকাদের সহযোগিতায় আমরা গুঞ্জনের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশ করছি। তাই আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কিন্তু শুধু পড়লেই তো চলবেনা, গুঞ্জনকে আপনার মনের মত করে সাজাতে হলে, আপনার মতামত আমাদের দফতর পর্যন্ত পৌঁছানো একান্ত জরুরি। সুতরাং আপনার মূল্যবান মন্তব্যগুলি লিখে শীঘ্রই আমাদের ই-মেলে পাঠিয়ে দিন।

আমাদের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

ভ্রমণ কাহিনী

মেবার ভ্রমণ

উদয়পুর পর্ব (২য় ভাগ)

মালা মুখার্জী

গাড়ি খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হল। অনেকক্ষণ জ্যামে সময় নষ্ট করার পর এলাম সহেলীওকি বাড়িতে। বাড়ি নয়, বারি, মানে বাগান – ভুল ভাঙল ওখানে পৌঁছে। রাণা সংগ্রাম সিংহ অষ্টাদশ শতকে এটি বানান তাঁর রাণী ও তাঁর আটচল্লিশ সখীর জন্য। মহারাণী বাপের বাড়ী থেকে আটচল্লিশজন সখীকে আনেন,

চিত্র পরিচয়ঃ ময়ূরচক...

তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাগান। এই বাগান আর ফোয়ারা, বিশেষ করে রেইন ফাউন্টেন, দেখার মত। ফতে সাগর

লেকের ধারে এই বাগানে ফোটো সেশ্‌ন অবশ্যই করবেন। বৃদ্ধদের জন্যও হুইল চেয়ার আছে।

চিত্র পরিচয়ঃ প্যালেস ও লেক-উদয়পুর...

এরপর কয়েকটা মিউজিয়ম দেখে সোজা শিল্পগ্রামে। এখানে ২১ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেলা চলে, আমরাও

চিত্র পরিচয়ঃ সহেলিও কি বারি-উদয়পুর...

মেলার সময়েই গেছি, তিলধারণের জায়গা নেই। তার মধ্যেই হাতের কাজ দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ ওপেন এয়ার থিয়েট্রে

বসে লোকনৃত্য দেখলাম। সন্ধ্যা হব হব করছে, তাড়াতাড়ি লেকের ধারে যেতে হবে সূর্যাস্ত দেখতে।

চিত্র পরিচয়ঃ উদয়পুর প্যালেসের বাগান...

লেকের জলে গেরুয়া রঙ ধরল, ক্রমে তা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে হতে আকাশের বুকে নেমে এল কালো অন্ধকার। শহরের ট্রাফিক ঠেলে ফিরলাম হোটেলে, ফিরেই সুখবর শুনলাম, একজন ড্রাইভার কুম্ভলগড় নিয়ে যাবে কাল, কিন্তু ভোর ভোর বেরতে হবে কম্প্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে, নইলে ভীড় হয়ে যাবে। আমি রাজি হলাম, যেকোনো মূল্যে যেতে চাই কুম্ভলগড়ে, তার জন্য সবকিছু করতে পারি, আর এতো সামান্য ব্রেকফাস্ট। কুম্ভলগড়ের সাথে রণকপুরও দেখাবে!

... ক্রমশ

প্রিয় অন্ধকার

দেবাশিস চক্রবর্তী

যত দূর দেখা যায়
আলো আলো খেলা
আমার গভীরের অন্ধকার
আমরা বুঝতে পারি না।

সাঁতার কাটা সময়গুলো
গোপনে গোপনে
ভালবাসার বীজ পুঁতে যায়,
গভীর অরণ্যর সেই পাইন
গাছটা মধ্যরাতে বাউল হয়।

ইলাস্টিক প্রেমিকাদের প্রবেশ
ওখানে নেই,রূপোলি জ্যোৎস্নায়
এক ধবধবে মায়া।
শিশিরে শিশিরে রাত
কথা লুকোতে চায়
আমার অন্ধকারে শুধু
আমার প্রিয় নারীদেরই
খুঁজে পাওয়া যায়। ■

কল্প বিজ্ঞান

অন্য পৃথিবীর পদ্ম বাগান

স্বাগতা পাঠক

পর্ব – ৩

ধর্মতলার কাছাকাছি একটা মাঝারি গোছের হোটেলের সামনে এসে ট্যাক্সিটা দাড়ালো। শ্রাবন্তী আর নিলাদ্রী দুইজনেরই বুকের মাঝে একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। আজ রাজর্ষি ওদের কি বলতে চায়, এমন ভাবে পরিস্থিতিটা সাসপেন্সে ঘিরে আছে ওদের আর তর সইছে না। ঘড়ির কাঁটায় তখন ৫ টা বেজে ১০ মিনিট। রুমের সামনে গিয়ে নক করতেই ৫-৭ সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলে গেলো। সামনে একটা অল্প বয়সি যুবক কে দাড়িয়ে থাকতে দেখে নিলাদ্রী একটু থতমত খেয়ে গেল। পরনে হলুদ রঙের টি শার্ট এবং মেরুন কালারের শর্টস। কিন্তু মুখটা বড্ড চেনা। নিলাদ্রী কে অমন বোকার মত দাড়িয়ে থাকতে দেখে যুবক ছেলেটি ওর হাত ধরে ঘরের ভেতরে টেনে নিল। আর শ্রাবন্তীকে বলল ভেতরে চলে আসতে। সমস্ত ব্যপারটা বুঝে উঠতে নিলাদ্রির একটু সময় লাগল, এই যুবকটি আর কেউ নয় রাজর্ষি। ওর মুখ থেকে বিস্ময় মিশ্রিত একটা কথাই বেরোল, “রাজা?”

শ্রাবন্তীর পক্ষে রাজর্ষিকে চেনা অসম্ভব না হলেও এই যুবক রাজাদাকে চেনা মুশকিল। কারণ শ্রাবন্তী রাজাকে

কল্প বিজ্ঞান

আগে কোনোদিন সামনাসামনি দেখেনি ঠিকই কিন্তু ওর ছবি দেখেছে। সে এক ত্রিশ-বত্রিশ বছরের প্রাপ্ত বয়েসের পুরুষ। কিন্তু আজ যাকে দেখছে এতো একেবারে ১৯-২০ বছরের যুবক। নিজের দেখা ছবিগুলোর সাথে সে মেলানোর একটা চেষ্টা করলো এই রাজাদাকে। নিলাদ্রী এতক্ষণে ধারণা করে নিতে পেরেছে এই সমস্ত কিছু অতি বাস্তব ঘটে যাওয়া ঘটনার পেছনের এক এবং অন্যতম কারণ ঐ পদ্ম ফুল গুলো।

তিনটে কফি অর্ডার করেছিল রাজর্ষি। রাজা তার কফিতে চুমুক দিলেও নিলাদ্রী আর পিকলু এখন উদগ্রীব হয়ে বসেছিল রাজার দিকে চেয়ে, কি অবাস্তব সত্যি আজ ওদের সামনে আসতে চলেছে!

রাজা নিলাদ্রীর দিকে একটা রহস্যময় নজরে তাকিয়ে কথাগুলো বলা শুরু করল। "যেদিন আমি তোকে ফোনে জানাই পার্সেলটা পেয়েছি, সেইদিন রাতেই আমি ওটা দেখি। প্রথমে ফুলটাকে হাতে নিয়ে আমার ওটাকে একটা সাধারণ পদ্মফুলই মনে হয়, তবে ফুলটার রং আমাকে বেশ মুশকিলে ফেলে দেয়। সত্যিই সবুজ রঙের পদ্ম ফুল তো আমি কোনো দিন চোখে দেখিনি। আর শুনেছি বলেও মনে হয় না। তখন আমি এটা নিয়ে পড়াশুনায় বসে পড়ি। আগে আমাকে জানতে হবে – সত্যি এই ধরনের পদ্ম ফুলের অস্তিত্ব আছে কিনা। ইন্টারনেট, বইপত্র অনেক কিছু

ঘাঁটলাম, পুরোপুরি ফুঁটে ওঠার আগে সাদা পদ্মের কুঁড়িতে সবুজ একটা আভা থাকে, কিন্তু একদম সবুজ পদ্ম ফুলের কোনো অস্তিত্ব নেই। পদ্ম ফুল নিয়ে আমার রিসার্চ চলল প্রায় দুই দিন। যদি কোনো কৃত্রিম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটার রং বদলে দেওয়া যায় তবে এমন রং হতে পারে। এখন আমার কাজ ছিল এটার মধ্যে কি কি জৈব অজৈব উপাদান উপস্থিত আছে সেটা খুঁজে বার করা। ফুলটা হাতে পেয়ে আমি ওটাকে একটা বড় ফুলদানিতে জল দিয়ে রেখেছিলাম। এরপর দুই দিন আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা। আমার বাড়িতে ল্যাবের ঘরের জানলার পাশেই ওটা রেখেছিলাম। দুইদিন আমি অফিস থেকে ফিরে ল্যাবে যাওয়ার সময় পাই নি। তৃতীয় দিন ল্যাবের দরজা খুলে ফুলদানীর দিকে নজর যেতেই আমি প্রায় ভূত দেখার মত করে চমকে গিয়েছিলাম। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।"

নিলাদ্রী শুকনো গলায় ঢোক গিলে বলল, "কি দেখলি রাজা?

রাজা একটু থেমে গিয়ে, আবার বলতে শুরু করল, "ফুলটির কাঁটা যুক্ত ডাঁটা থেকে সারিসারি সাদা মূল বেড়িয়ে ছড়িয়ে গেছে জানালার কাঁচে, এবং শুধু কাঁচে নয় আমার ল্যাবের সারা মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ল্যাবে যত রকম তরল পদার্থ ছিল সব কিছু ঐ মূল দিয়ে শোষণ করে চলেছে। বললে বিশ্বাস করবি না, একটা টেস্ট টিউবে কিছুটা পরিমান নাইট্রিক অ্যাসিড ছিল, সেটা পর্যন্ত শুষে

নিয়েছে। এই দৃশ্য দেখার পর আমি নিশ্চিত ছিলাম এই ফুল সাধারণ কোনো ফুল নয়। সমস্ত ল্যাব পরিষ্কার করে আমি দেখলাম ফুলদানি একেবার জল শূন্য। আমি এটা বুঝতে পারলাম, জল শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে এই উদ্ভিদ নিজের তাগিদে নিজের বাঁচার ঠিকানা খুঁজে নিতে পারে। অন্য বাকি ফুলের মত ঝরে যাওয়া এর বৈশিষ্ট্য নয়। বুকের ভেতরটা রোমাঞ্চে ভরে গেল এটা ভেবে, মেডিক্যাল জগতে একটা বিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে যদি আমরা এই বিস্ময়কর ফুলটার সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করতে পারি। সেদিন থেকেই অফিসে ছুটি নিয়ে কাজে লেগে পড়লাম। প্রথমে ঐ ছড়িয়ে পড়া শিকড়গুলো দিয়ে শুরু করলাম পরীক্ষা। জল, আর নাইট্রিক অ্যাসিড ছাড়া বিশেষ কিছুই পেলাম না। আর যদি কিছু থেকেও থাকতো, তবে সেটা অ্যাসিড এর প্রভাবে শেষ হয়ে গেছে। এর মাঝেই আরও একটা বিষয় আমার সামনে এল প্রতি চার ঘন্টা অন্তর ফুলদানির জল শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে আরও দুইতিন দিন কেটে গেল, ফুলটা যেন আরও বেশি সতেজ আর বড় হয়ে উঠতে লাগল। এবার আমার শেষ চেষ্টা, ফুলের কান্ডটি থেকে এক ইঞ্চি অংশ কেটে নিলাম। দিন রাত এক করে চলতে থাকলো আমার পরীক্ষা। টানা দুই দিন পরীক্ষা করার পর আমি যা সব তথ্য আবিষ্কার করলাম, তা ভাবতেই আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছে।” এই অবধি বলে রাজর্ষি থামল।

পিকলু আর নিলাদ্রীর চোখে তখন উত্তেজনা। পিকলুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। দুটো কাপের কফি এখনও একই ভাবে পড়ে আছে।

রাজা এবার বলল, "তোরা তো কফি খেলিনা, আমি আরো দুটো অর্ডার করি।" শ্রাবন্তী বাঁধা দিয়ে বলল, "রাজাদা থাক, আমদের দুইজনের মধ্যে কেউই এখন কফি খাওয়ার অবস্থায় নেই, সেটা তুমি বুঝতেই পারছ, প্লিজ তুমি তারপরের ঘটনাগুলো বল।"

টেবিলের উপর রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে, চেয়ার ছেড়ে রাজা উঠে গেল জানালার পাশে, তিনতলা হোটেলের কামড়ার থেকে নিচের শহরটার দিকে তাকিয়ে রাজা বলল, "বুঝলি পিকলু, মানুষের সময় আর ভাগ্য যে কখন কি ভাবে বদলে যাবে কেউ বলতে পারে না।"

নিলাদ্রী আর শ্রাবন্তীর অস্থিরতা রাজার চোখ এড়াল না। রাজা আবার বলতে শুরু করল, "সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ করে আমি যা জানলাম, সেটা এই যে – ফুলটি একটি বিশেষ পরিবেশে জন্মায়, যেখানে জল আছে, অক্সিজেন তো আছেই, কিন্ত আছে আরো কিছু খনিজ পদার্থ যেগুলোর অস্তিত্ব আমাদের পৃথিবীর কোনো কোণাতেও নেই, আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এইটুকু জেনেছি। একটা পদার্থও এই পৃথিবীর না, শুধু জল আর

অক্সিজেন ছাড়া। যদি কোনো রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণেও এটা তৈরী হতো সেটার অস্তিত্ব আমি পেতাম। কিন্তু এমন কোনো রাসায়নিক এখনো আমাদের বিজ্ঞানীরা তৈরী করতে পারেনি যেটা এই ফুলের মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু এটা ঠিক অক্সিজেন ছাড়া এই উদ্ভিদের বেঁচে থাকা অসম্ভব। আর জল, এই উদ্ভিদ এর মাঝে যে জলের উপস্থিতি আছে সেটা সাধারণ জল নয়। অতীব মিষ্টি একটি তরল পদার্থ। যা স্যাকারিন এর থেকেও মিষ্টি। তারপর আমি জলের সাথে যতটা সম্ভব চিনি মিশিয়ে ফুলদানিতে জল রাখলাম, কিন্তু না সেটাও ৭ ঘন্টার বেশি থাকছে না।”

একটু চুপ থেকে, রাজা আবার শুরু করল, “এর মাঝেই একদিন ঘটলো একটা ঘটনা। এক অফিসে কাজ করতে গিয়ে একজনের সাথে আমার একটা সম্পর্ক হয়। আমি কদিন অফিস যাইনি, এবং তার সাথে ফোনে সেরকম কথাও বলা হয়নি। সে জানত আমি কাজের মাঝে থাকলে এমনটা হয়। এর মধ্যে সে কিছু ভয়েস মেল পাঠিয়ে রেখেছিল আমাকে। হাতে একটু সময় পেয়ে সেগুলোই শুনছিলাম। সেগুলোর মধ্যে একটাতে সে আবদার করে বলেছিল, অনেক দিন আমাকে দেখেনা একবার আমাকে দেখতে চায় একটা সেলফি তুলে যেন আমি তাকে পাঠিয়ে দিই এই মেসেজ পাওয়ার সাথে সাথে। রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে আমি যখন ল্যাবে যাব আবার কাজ করতে, তার

কল্প বিজ্ঞান

আগে একটা সেলফি তুলতে গিয়ে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। ফোনের ক্যামেরায় আমি নিজেকে দেখে নিজেই চিনতে পারছিলামনা। মনে হল এটা আমি কাকে দেখছি! এক ধাক্কায় আমার বয়েস যেন পাঁচ বছর কমে গেছে। কাজের চাপে ঠিকঠাক করে স্নান খাওয়াটাও হতো না, আয়নায় নিজেকে আমি অনেকদিনই দেখিনা। তবু...

সেই সময় আমি আমার এই ক'দিনের কাজ করার অভিজ্ঞতা একবার ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। কি কি পরিবর্তন আমি পেয়েছি। ল্যাবে তথা আমার বাড়ির একটা কোনাতেও আমি বিগত কিছু দিনে একটা টিকটিকি তো দূর, একটা মশারও দেখা পাইনি। আমার বাড়িতে যে ছোটো ছোটো ফুলের গাছগুলো আছে সে গুলোও যেন একটু মুষড়ে পড়েছে। এবার আমি নিজের কথায় আসি, ইদানিং পর পর এতগুলো রাত জাগার পরও আমার মধ্যে কোনো ক্লান্তি নেই। খিদে ঘুম যেন কোনোকিছুর তোয়াক্কাই আমি করছি না। কিন্তু তবুও আমি বেশ স্বতস্ফুর্ত অনুভব করছি।এবার আমার কাছে সমস্ত বিষয়টা পরিস্কার হয়ে গেল। এই ফুলের মধ্যে এমন কিছু গুন বা দোষ যাই হোক কিছু আছে, সেটার প্রভাব আসে পাশের জীবিত প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের ওপর পড়ছে। একটা তীব্র রেডিয়েশন আছে যেটা যে প্রাণী যে ভাবে গ্রহণ করবে, তার উপর সেটার প্রভাব সেইভাবে পড়বে। ছোট ছোট কীট পতঙ্গ এই রেডিয়েশন

নিতে অক্ষম এমনকি ছোট ধরনের গুল্ম জাতীয় গাছ পর্যন্ত সেটার প্রভাব থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু বড় কোনো গাছ সেটার প্রভাবে আরো বেশি হৃষ্টপুষ্ঠ হয়ে ওঠে, এবং মানুষের উপর এর প্রভাব অনেক বেশি বিস্ময়কর, এই ফুলের রেডিয়েশনের মধ্যে থাকলে যে কোনো মানুষ তার ইচ্ছে মতো যৌবন ধরে রাখতে পারবে। মানে এই ফুল দিয়ে আমরা অনেক মারণ রোগের ঔষুধ তৈরী করতে পারি। যেমন ক্যান্সার।"

এবার নিলাদ্রী বলল, "ইউরেকা, দারুন বিষয় আমরা তো তবে মেডিক্যাল জগতে একটা বিল্পব আনতে চলেছি।" শ্রাবন্তীর মুখেও একটা হাসির ঝলক খেলে গেল। রাজর্ষি বলল, "তবে এখন আমাকে জানতে হবে, এই ফুল তোরা পেলি কোথায়?" এবার শ্রাবন্তী আর নিলাদ্রী একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। তারপর শ্রাবন্তী সমস্ত ঘটনাটা রাজর্ষিকে বলল।

সব শুনে রাজর্ষির তো মাথায় হাত। সে হতাশভাবে বলল, "মানে এই ফুলের অস্তিত্ব এই পৃথিবীর কোনো কোণাতেই নেই। তবে শুধু মাত্র এই পাঁচটা ফুল দিয়ে হবে কি?"

শ্রাবন্তী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নিলাদ্রী রাজাকে বলল, "সব তো ঠিক আছে, কিন্তু তোর এই ভাবে ব্যাঙ্গালোর থেকে চলে আসা, পুরনো নম্বর বন্ধ করে দেওয়া, গোপন ভাবে আমাদের সাথে দেখা করা, এইগুলোর কারণ

কি?" রাজর্ষি এবার, নিলাদ্রীর দিকে তাকাল, ওর কপালে ভাঁজ পড়েছে। সে আরও একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "দেখ তোদের কাছে আর কি লুকোব, যখন আগামী দিনগুলোতে আমাদের তিনজনকেই এক সাথে চলতে হবে। এমন একটা বিস্ময়কর জিনিস আমার হাতে এসে পড়েছে... আমি সবার আগে রুচিরাকে জানানোর কথা ভাবলাম।"

শ্রাবন্তী কথার মাঝে বলে উঠলো, "রুচিরা কে, রাজা দা?"

রাজর্ষি বলল, "আমি যার কথা বললাম, একই অফিসে কাজ করি, আমার বান্ধবী।" আবার সিগারেটে একটা টান দিয়ে রাজর্ষি বলা শুরু করলো, "একদিন সন্ধ্যা বেলায় আমি ওকে আমার বাড়িতে ডাকলাম। সমস্ত কিছু জানালাম। সেও তোদের মত এতটাই খুশি হয়েছিল। কিন্তু আমার একটা প্রস্তাবকে খুব বাজে ভাবে রিজেক্ট করল। বলার মধ্যে বলেছিলাম, আমি এই ফুল থেকে যে ওষুধ তৈরী করব সেটার মার্কেটিংটা হবে, জাপান থেকে। ওরা আমাকে এর জন্যই বিলিয়নস অফ ইয়েন (জাপানী মুদ্রা) দেবে। কিন্তু না তার একই কথা, সে জেদ ধরে বসে থাকল, মেডিসিন থাকবে তো এই দেশেই এই দেশেই তোমার ঔষুধের ফর্মুলা রাখতে হবে। আমি বললাম, "ভেবো না ভারতে ঔষুধ আসবে কিন্তু তিনটে দেশের হাত ঘুরে।" কিছুতেই বোঝানো গেল না তাকে। শেষে আমাকে হুমকি দিল, সে আমার কোম্পানিকে সব জানিয়ে দেবে। তাই বাধ্য হয়েই

আমাকে তার বডিটা পিস পিস করে কেটে নিজের ঘরে ফ্রিজে বন্ধ রেখে আসতে হলো।”

নিলাদ্রী আর শ্রাবন্তী ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওদের মুখে চোখে তখন ভয় আর আতঙ্ক। দুইজনেই দরদর করে ঘামছে, এই দারুন শীতের সন্ধ্যায়। একটা সুটকেস দেখিয়ে নিলাদ্রী বলল, “ফুলটাকে ঐ ব্যাগের মধ্যে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে টুকরো করে সংরক্ষণ করা আছে। আজ রাত ১০টা ৩০ মিনিটের ফ্লাইটে আমি জাপান চলে যাচ্ছি। আর কোনদিন ফিরব না। পরিবারকেও নিয়ে যাব খুব তাড়াতাড়ি।”

এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে নিলাদ্রীর কাছে এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে রাজা বলল, “আগামী চারদিনের মধ্যে তোদের দুইজনের জাপান যাওয়ার ফ্ল্যাইটের টিকিট পৌঁছে যাবে তোদের কাছে। ফুলগুলো নিয়ে তোরা কি ভাবে কোথায় আসবি, সেটা জানিয়ে দেব।”

নিলাদ্রী আর শ্রাবন্তি নিঃশব্দে দরজার কাছে আসতেই, রাজা আবার বলল, “পিকলু, ফুল আনার জন্য আমাদের অন্য পৃথিবীতে যেতে হবে না, যে ফুল এই পৃথিবীর পরিবেশে শিকড় ছড়িয়ে দিতে পারে সে ফুলের চাষ আমরা এইখানেই করতে পারব, বিজ্ঞান আজ অনেক উন্নত। আমার কাছে যে ফুলটি আছে, সেটা কেটে টুকরো টুকরো করা। তোমার কাছে থাকা বাকি চারটে ফুল এখন আমাদের আগামী দিনের পথ দেখাবে।”

শ্রাবন্তী অতি কষ্টে হাসির চেষ্টা করে বলল, "নিশ্চই রাজা দা, তুমি যেমনটা বলবে।"

নিলাদ্রী তখন রাগে, দুঃখে, যন্ত্রনায় ফেটে পড়তে চাইছে। কিন্তু অতি কষ্টে রাগটা চেপে রেখেছিল, পিকলুর অমন সহমত দেখে শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর আটকাতে পারল না, সে বলেই বসল, "লোভ মানুষকে এতটা নীচে নামাতে পারে, আমি ভাবতেও পারছি না।"

এবার রাজর্ষি উঠে এসে, নিলাদ্রীর কাঁধে হাত রেখে বলল, "বন্ধু,এখনো আমি নীচে নামিনি, আর আগামী দিনেতেও আমাকে সেটা করতে বাধ্য করিসনা। আমি থাকব জাপানে, কিন্তু আমার নজর থাকবে তোদের উপর ২৪ ঘন্টা। যতক্ষণ না বাকি ফুলগুলো আমার হাতে এসে পৌছে যায়।"

ফেরার সময় ট্যাক্সিতে বসে নিলাদ্রী একটা কথাও বলেনি শ্রাবন্তীর সাথে। শ্রাবন্তী ওর হাতের উপর হাত রাখতেই, ঘৃনা ভরে হাতটা সরিয়ে দিয়ে, নিলাদ্রী বলল, "আমি ভাবতে পারছিনা, তুমি একটা খুনিকে সমর্থন করছ, শুধু মাত্র টাকার জন্য!"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর, ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে নিলাদ্রীকে একটা ছবি দেখাল শ্রাবন্তী, ওর ঘরে ফুলদানিতে চারটে নয় প্রায় ২০ টা রং বেরঙের

পদ্মফুল মাথা তুলে বিরাজমান। নিলাদ্রী এবার বিস্ফারিত চোখে শ্রাবন্তীর দিকে তাকাল।

শ্রাবন্তী বলল,"যে মানুষটার পক্ষে নিজের প্রেমিকাকে খুন করে দেওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার, সে আমাদের সাথে যা খুশি তাই করতে পারে। তাই আমার সেই মুহুর্তে যেটা বলা ঠিক মনে হয়েছে সেটাই বলেছি। যদি সমর্থন করতাম তাহলে আগেই বলে দিতাম, আমার কাছে চারটে না ২০ টা ফুল আছে। আর এই ফুলগুলি অনায়াসে সাধারণ জলের মধ্যে থেকে যেকোনো পরিবেশে নিজের কান্ড থেকে বংশ বিস্তার করতে সক্ষম।"

...ক্রমশ ■

স্বপ্ন

দোলা ভট্টাচার্য

সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে
সেদিন দেখলাম এক মিথ্যে গল্প
দুপায়ে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।

আবছা অন্ধকার ভেদ করে
আমার সামনে এসে দাঁড়াল সে,
চিনতে পারো আমায়!
চিনি। নিশ্চয়ই চিনি।

ওই তো জীর্ণ বটগাছটা
অজস্র ঝুরি নামিয়ে ভাঙা মন্দিরটাকে
বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,
ওরই ভাঙা চাতালে বসে
স্বপ্ন দেখে এক বৃদ্ধ হনুমান।

বন্ধ হয়ে যাওয়া এক অতিকায়
কারখানার গেট, ভেতরে তার
বাস করে মালিক রাজ।
আকাশপথে উড়ে চলে তার
বিশাল বিশাল মার্সিডিস ট্রাক।

ক্যানভাস

তাদের ডিজেলের ধোঁয়া
ভূমিকে করে কলুষিত।
অন্তরালে থেকে কলকাঠি নাড়ে সর্দারের দল,
হারিয়ে যাওয়া রঞ্জনকে আজও
খুঁজে ফেরে নন্দিনীর আত্মা,
বিশুভাই আজও গেয়ে চলে কপাট ভাঙার গান।
কপাট ভাঙে না, হস্তান্তরিত হয় শুধু
মালিক রাজের রাজত্ব।
বৃদ্ধ হনুমানের স্বপ্ন টা স্বপ্নই থেকে যায় ।
শ্মশানে পোঁতা হয় রক্তকরবীর বীজ ॥ ■

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) ‘গুঞ্জন’ এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।
আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com
২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।
৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা ‘গুঞ্জন’ এর জন্য পাঠাবেন না।
৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

গুঞ্জন পড়ুন ও গুঞ্জন পড়ান

কৃষকের অভিশাপ

নাহার আলম (বাংলাদেশ)

বন্ধ করে রাখি যতোই ব্যর্থতার
পাথর কঠিন দ্বার,
তবুও প্রসব করে রোজই কিছু না
কিছু কর্পোরেট হাহাকার!
ন্যায্য হিস্যা না পাওয়া কৃষকের
মলিন হাসির আলোকের অভিজ্ঞানে,
রেখেছি লুকিয়ে যতনে,
ক্রমাগত পরাজয়ের সফল বেদনারে
আমার নিজস্ব আড়াল পালকে।

নিয়মের সুতোয় বাড়ে রাত, অতঃপর...
নিঃশ্বাস খোঁজে আড়াল প্রশান্তি,
কলম ও কালির দুর্বিনীত আহ্বানে।
লুকোচুরি চাঁদের সাথে মিশে করে খেলা
কপটচারী ভদ্রজনদের উপসংহারময়
উপেক্ষার হাসি রাশি রাশি...
কৃষকের মতো তখন আমারও
হৃদয়ের ভাঙনে লাগে হাওয়া
এক শীতল মরণ সমান।

বাস্তব

বারোমাসি বাসি রোদভেজা শ্রান্ত শব্দ মূর্ছনায়,
মাতে শিরিষের মগডালে
বসা এক নির্বোধ কোকিল;
আমিও বাড়িয়েছি পা মুক্তি তৃষ্ণায়
নিষেধের ওপার,
রাতেরা ঘুমিয়ে এলে পরে যখন
নিষিদ্ধ যৌনতায় মাতে নষ্ট নিখিল।
সবিতা কৃষাণির লাজরাঙা ছেঁড়া আঁচল জড়ানো এক চিলতে
বুকের মতোন বারেবারে হই আমিও সবিনয়ে আমার
ইচ্ছে-মরণের কাছে নত।
ক্ষয়িত বিধির উপচারে ঝরে, ঝরুক না
কিছু নষ্ট-কষ্ট-জল, ক্লান্ত মন চিবুক
চুঁইয়ে চুঁইয়ে অবিরত।

ওইদিকে সুনীল আকাশে
মেঘের চাঁদোয়ায় মুখরিত সুখে
অবুঝ স্বপ্ন পাখিরা ওড়ে,
উড়ুক; ভালোবাসায় হোক না প্রবাহিত।
ক্ষতি কি? আর এইদিকে কৃষকের
অভিশাপে হাসিরা ফুরায়,
নিরাশায় কাঁদে ঘাস ফসলের মাঠ,
সবুজের বুক পোড়ে দাউদাউ, পুড়ুক না;

বাস্তব

তাতে কারই বা এলো গেলো কি?
বিস্মরণের অমরতায় থাকে বেঁচে
আজন্মকাল বুকে চেপে অসহায়
কৃষকের এমনই কতশত হাহাকার!
উবে যায় কতশত কৃষাণির
লাল ফিতে কেনার অভিলাষ!

বোঝে না তবুও
কেউ কোনোজন!
অন্ধ সমাজ রাষ্ট্র কিংবা বিশ্ব...
যেন কংক্রিট মন, সুশোভন দালানের
চকমকি আলোয় সুরার গ্লাসে ভাসে
কৃষকের হাসির লাশ আর
কৃষাণির দীর্ঘশ্বাস!
অসভ্যজনেদের বাড়ে যেন
তাতেই উল্লাস। ■

শ্রমিক দিবস

পত্রের আড়ালে

রাজশ্রী দত্ত

অভিমানী,

তোমাকে আজ চিঠি লিখছি না, লিখছি এ জীবনের এক টুকরো পাতার কথা। জানি লেখার প্রথমে ডাকা শব্দটা দেখে রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেও মনে মনে তুমি এই ডাকটাই শুনতে অভ্যস্ত। এক টুকরো জীবনের ভেলাটা বইতে বইতে আজ বড়ো মনে পড়ছে, সেই অতীতের ঝাপসা অথচ উজ্জ্বল স্মৃতিগুলোর কথা। আমার তখন বয়স সাত হবে, হঠাৎ করে সাতটা জন্মের যেন সমাপ্তি ঘটল অকালেই। চটকল বাবাকে দিল চিরবিদায়। একটা শিল্পের মৃত্যুর সাথে ঘটে অজস্র শ্রমিকের শ্রম ও জীবনেরও মৃত্যু। আর এই অভাব ধীরে ধীরে যখন নিত্য দিনের স্বভাব হয়ে যায়, তখন সব ভুলে কেউ ডোবে মরণ জোয়ারে, কেউবা ডোবে নেশার জোয়ারে। সেক্ষেত্রে কোনো বৈপরীত্য ঘটেনি আমার পরিবারেও। সংস্কার বসেই হোক কিংবা মধ্যবিত্ত সমাজের পরিমিত চিন্তার কারণেই হোক, বলা যায় অভাবী সংসারে নারীর গন্ডি থেকে যায় সীতার মতোই। তাই মেয়েদের শিক্ষা কিংবা কর্ম দুই ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু পেটের জ্বালায় কোনো নারী এই গন্ডি পেরোলেই জুটত প্রহার, তবে তার বদলে মা অন্নপূর্ণার মতো

দু'হাতে সেই নারীই তুলে দিত আহার। তবে সে সুখও বোধ হয় টেকে না। তাই অন্নপূর্ণা হারিয়ে যায় ভীষণ প্রহারে, আর নেশাগ্রস্ত বীরপুরুষ যায় নেশার অতলে।

আর এই গোটা বিশ্ব আমাকে অনাথ জীবন উপহার দেয়। যে বয়েসে ছেলেরা যায় বইয়ের গন্ধ মাখতে, নতুন কিছু শিখতে। সে বয়েসে আমিও শিখে ফেলি লোকের এঁটো বাসন মাজতে।

তুমি নিশ্চয়ই বলবে – যে স্মৃতি ব্যাথা দেয়, তা মনে না রাখাই শ্রেয়। আমি তোমায় প্রতিবারের মতো একই কথা বলব, ব্যাথা না পেলে ওষুধের খোঁজ হয় না।

জানো তো সেই সময় সারাটা দিন আমিও অনেক গল্প শুনতাম, ওই যে প্রতিটা টেবিলে নিত্যদিনে নতুন নতুন চরিত্রগুলো, কেউ জানাত তিরস্কার, কেউবা লোকদেখানো সহানুভূতি দিত পুরস্কার।

আর সর্বশেষে উচ্ছিষ্ট স্বর্গীয় আহারই পেতাম, যা আমার খিদে মিটিয়ে আসল সুখ দিত। মায়ের বানানো সেই নকশি কাঁথাটাই ছিল আমার একলা রাতের একমাত্র সঙ্গী। তবে সব দিন এক যেত এটা ভাবা ছিল বোকামি। কারণ মাঝে মাঝে আমি ও আমার মতো আর পাঁচজনও পেত সুখের স্বাদ। আমাদের এই সুখ নিয়ে একটা মজার ঘটনাও আছে, তা হল প্রতিবারের শ্রমিক দিবসের দিনটা। আমার মতো গন্ডা কতক বাচ্চা ছেলেকে

শ্রমিক দিবস

একটা জমায়েত সভায় ডেকে অতি সযত্নে মন্ডা মিঠাই দিয়ে মন ভরিয়ে দিত। মনে হতো এনারা ভগবানের দূত। তবে এই মানুষগুলোরই এঁটো পরিষ্কারে জন্য ভোজন শেষে আমাদেরই ডাকা হত। চোখের কোণে জমা জল তখন বারবার একটাই কথা বলত, সমাজ যা দেয় তার বেশি নেয়। এই ধারণাই আজীবন বয়ে নিয়ে যেতাম, যদি না দেবদূত হয়ে পাড়ার মাস্টারমশাই আসতেন সেদিন আমার জীবনে।

হয়তো আমার পড়ার ইচ্ছাটা ওনার চোখ এড়াতে পারেনি! তাই কাগজে কলমে আজ এতটা লিখতে পারি। অনাথ ছেলেটি তাই আজ তার মাস্টারের দেওয়া শিক্ষার পথে অনুগামী। তবে শুধু শিক্ষিত মানুষ নয়, প্রকৃত মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষাটাও তিনি দিয়েছেন।

তাই আর একটাও শৈশব অকালে ঝড়ে যেতে বা হারাতে দিই নি, এই চেনা শহরের বুক থেকে। তবে সময় থমকে থাকে না, তাই এখনও অনেক কুঁড়ি মাটিতে পড়ার আগে যত্ন করে সাজিয়ে রাখা বাকি আছে। কিন্তু আমার ছুটির ঘণ্টাটা যে বড় তাড়াতাড়ি নেমে এসেছে আমার চোখের কোণে। হয়তো বা একমাস, হয়তো বা একদিন বাকি আছে আর...

তবে তোমার ওপর আমার আস্থা আছে...। আমাদের সাজানো বাগানটা তুমি রাখবে সযত্নে। যেভাবে ধরেছিলে

অকপটে এই অনাথ নিঃস্বের হাত, ঠিক সেইভাবে। না অভিমানী আজ আর অভিমান নয়, শেষ বিদায় কালে দুচোখ ভরে দেখতে চাই, তোমাকে ঘিরে আছে মাস্টারমশাই, তুমি আর আমি মিলে গড়ে তোলা সেই কচি প্রাণগুলো। আর ওদের মাঝে থাকবে তুমি। তোমার মুখে লেগে থাকা মিষ্টি হাসিটা দেখতে চাই আর একটিবার... ■

চিত্রগ্রাহক — রাজশ্রী দত্ত

"বাঁকুড়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামের পড়ুয়ারা, যাদের কাছে পড়ার খাতা-বইটুকুই হল জীবনের সবচেয়ে সেরা উপহার। শিশুরাই ভবিষ্যতের উজ্জ্বল নক্ষত্র।" ■

মৈত্রী এক্সপ্রেস

শামসুদ্দিন শিশির (বাংলাদেশ)

রোজার ছুটিতে দেশের বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা আগেই ছিল। সরকারি অনুমতি পাওয়ার পর পরই সহকর্মী মহসীন সাহেবের সাথে আলোচনা করি। উভয়ের সিদ্ধান্তেই প্রথমে ভারত ও পরে অন্য দুটো দেশ ভ্রমণের কথা ঠিক হয়। কোন পথে যাব? সড়ক, আকাশ নাকি রেলপথ? ট্রেনে যাওয়া চূড়ান্ত হল। সময় মতো টিকিট নিলাম। একটা অন্য রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।

মৈত্রী এক্সপ্রেসে, ঢাকার সেনানিবাস স্টেশন থেকে সকাল আটটা ষোল মিনিটে যাত্রা শুরু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমরা দুজন আগের দিন ঢাকায় ভাইএর বাসায় ছিলাম। সকালে ছোট ভাই তার গাড়িটা নিয়ে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছে। ট্রেন ছাড়ার আগে ইমিগ্রেশনের কাজ সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হয়। গাড়ি ছুটল, জানা অজানা কত জনপদ, নদী, পাহাড় পেরিয়ে বিকেল চারটায় কলকাতা স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। এবার আমরা অন্যরকম এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত জানাব। কলকাতা স্টেশনের ইমিগ্রেশন অফিসর আমাদের দুজনকে

একটা বিশেষ কক্ষে যেতে বললেন। অপরাধ কী বুঝতে পারলাম না! পরে বুঝলাম অপরাধ সততা। আমরা কাস্টম প্রদত্ত ফর্মে আমাদের কাছে কত টাকা (বাংলাদেশি অর্থ), রুপি (ভারতীয় অর্থ) এবং ডলার (অ্যামেরিকান অর্থ) আছে তা উল্লেখ করেছি। একজন পুলিশ সদস্য বললেন, ‘আপনি এত রুপি নিয়ে কেন এলেন? কিছু দিতে হবে।’ এতো অবাক হলাম যে মুখে কোন শব্দ বের হল না। এমনভাব – যেন ওনাদের মনে হলো আমরা চুরি করে টাকা পয়সা নিয়ে এসেছি, তাই ওঁদের ভাগ দিতে হবে! এই কথা এক কান দুকান হতে হতে পুলিশের বড় কর্তার কাছে গেল। উনি এসে আমাদের পরিচয় জানলেন এবং আমাদের সম্মান জানিয়ে যেতে বললেন।

এদিকে পিনাকীদা আমাদের অপেক্ষায়। তিনি পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস। ২০১৮ সালের কোন এক সোনালী সকালে বাংলাদেশে এসেছিলেন। ভ্রমণেই মহসীন সাহেবের সাথে পরিচয়। কয়েক ঘন্টার পরিচয় আজীবন পরিচয়ের রূপ নিল। হয়ে গেল আত্মার আত্মীয়তা। যা আজও অমলিন। তাঁর আমন্ত্রণেই আমাদের ভারত ভ্রমণ। ঢাকার সেনানিবাস স্টেশনে এসেই পিনাকীদাকে জানিয়েছি আমরা মৈত্রী এক্সপ্রেসে আসছি।

তিনি যথা সময়ে স্টেশনে এসে হাজির। দাদার গাইডেন্সে স্কুটার ভাড়া করে মেট্রোরেল স্টেশন। পার্কস্ট্রিটে নেমে

অভিজ্ঞতা

দু'কদম পায়ে হেঁটে মার্কুইস স্ট্রীটের হোটেল ওরিয়েন্টাল। যা আগেই দাদা বুক করে রেখে ছিলেন। হোটেলটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ভাড়া আয়ত্বের মধ্যে। ম্যানেজারসহ সকলেরই ব্যবহার খুব ভাল। ওয়াই-ফাই সংযোগ বাড়তি পাওনা। যদিও ভারতেও সব হোটেলেই ওয়াই-ফাই ফ্রি, তবুও কোন কোন হোটেলে কিছু ভিন্ন নিয়ম কানুন আছে। যেমন রুমের ভেতরে না, বাইরে এসে ওয়াই-ফাই ফ্রি পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে অন্যদিন বলব। পিনাকীদা রাত দশটা অবধি আমাদের সাথে থেকে কোলকাতার ঠাকুরপুকুরে চলে গেলেন। সেখানেই তাঁর বাড়ি।

পর দিন সকালে আবার এলেন। আমাদের নিয়ে কলকাতা ঘুরতে বের হলেন। শহরের বিখ্যাত সব পথ, দালান, স্তম্ভগুলোর আলাদা আলাদা বর্ণনা দিলেন। যতই শুনছি অবাক হচ্ছি এই মানুষটি এতো জানেন! একবার বলেই ফেললাম পিনাকীদা বই লিখুন। উনি হেসে বললেন, "আরে ভাই এগুলো সবাই জানেন। আপনি নতুন এলেন তো তাই অবাক হলেন।"

তারপর গভর্নর হাউজ, গীর্জা, জিপিও, ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, রেলভবনসহ প্রতিটি ঐতিহাসিক স্থাপনার নিখুঁত বর্ণনা দিলেন। মুগ্ধ হয়েছি, সমৃদ্ধ হয়েছি। এক ফাঁকে বাংলাদেশের বরেণ্য কথাসাহিত্যিক ডক্টর আজাদ বুলবুলএর লেখা উপন্যাস 'অগ্নিকোণ' ভারতের সমসাময়িক কালের প্রাজ্ঞ ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর সাথে কথা

হল। তিনি কলকাতার বই পাড়া কলেজ স্ট্রিটএর মিত্র এন্ড ঘোষ পুস্তকালয়ে বইটা পৌঁছে দিতে বলেছেন, তাই করা হল।

কোলকাতা বেড়ানোর সুযোগে মনের সন্তুষ্টির জন্য পুরো শরীর চেক আপ করে নিতে পারেন। পিনাকীদার পরামর্শক্রমে মুকুন্দপুর নারায়ণা হসপিটালে গেলাম। মার্কুইস স্ট্রিট থেকে খুব দূরে না। স্কুটার ভাড়া ২৫০-৩০০ রুপি মাত্র। বিধি অনুযায়ী প্রতিদিন ২৫ জনের চেক আপ হয়, ডাক্তাররা রিপোর্ট দেখেন। পরামর্শ দেন। পুরো প্যাকেজ ৬৬০০ রুপি। ভ্যাটসহ ৭০০০ রুপি। শৃঙ্খলা, সময়ের প্রতি শ্রদ্ধা, সকলের বিনয়ী আচরণ সব কিছু থেকে শিখেছি। যেখানেই গিয়েছি লাইন। কে আমীর কে ফকির তার হিসেব নেই। সবাই সমান। কেউ আগে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাড়াহুড়ো করেও লাভ নেই। সময়ের কাজ সময়ে শেষ। খুব ভাল লেগেছে খাওয়ার আগে ও পরের রক্ত পরীক্ষা। খাবার আগে রক্ত দিলাম, দু'ঘন্টা পর আবার। মাঝের খাবার সরবরাহ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই পরীক্ষাগুলো করার জন্য ১২ ঘন্টা খালি পেটে থাকতে হয়। চলতি কোন ওষুধ থাকলে সেটাও বন্ধ। পানি ব্যতীত কোন কিছু খাওয়া যাবে না। আজ চেক আপ, কাল রিপোর্ট। চমৎকার ভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী ডেকে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার পরামর্শ দিবেন। প্রয়োজনে হাসপাতালেরই অন্য কোন ডাক্তারকে রিপোর্ট দেখানোর জন্য পরামর্শ দিবেন। ঐ

ডাক্তার কোন ভবনে কত নাম্বার কক্ষে বসেন তাও বলে দেন।

নারায়ণা হসপিটাল থেকে চেক শেষে গড়িয়াহাট গেলাম। এলাহী কান্ড। মার্কেট, ফুটপাত এমনকি রাস্তা সবই হকারদের দখলে। যে যার মতো কেনাকাটা করছে। ক্রেতারও অভাব নেই। কয়েকটি দোকান পর পর খাবারের দোকান। ফলের দোকান, জুসের দোকান যার যা প্রয়োজন নিচ্ছে, খাচ্ছে, চলছে এবং শপিং করছে। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে একাকার।

চলাচলের জন্য উবার, টেক্সিই সহজ প্রাপ্য বাহন। সেখানেও যাত্রীর ককথাবার্তা শুনে ড্রাইভার ভাড়া কম বেশি চায়। কিন্তু পিনাকীদা'কে ফাঁকি দিতে পারেনা। চালক হিন্দি কথা বললে দাদা হিন্দি, বাংলা বললে দাদাও বাংলা আবার ইংরেজি বললে দাদা ইংরেজি। উবার এসি হলে মোট ভাড়ার সাথে ২৫% যোগ হবে মানে ১০০ রুপি মিটারে উঠলে ১২৫ রুপি দিতে হবে। নন এসি উবার বা টেক্সি নিলে, যা ভাড়া আসবে তাই দিতে হবে। তবে যাওয়ার প্রয়োজন বুঝে ৮০ রুপির ভাড়া ৩০০ রুপি চাইবে। সে ক্ষেত্রে সাবধান থাকা ভাল।

ঈদ উপলক্ষে কলকাতার শপিংমল গুলোতে উপচে পড়া ভীড়। ভারতীয়দের পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। প্রচুর বাংলাদেশী শপিং করতে গেছেন।

তবে বেশির ভাগই চিকিৎসার ফাঁকে, বেড়ানোর ফাঁকে শপিং। একের ভেতর তিন বা চার কাজ। তবে ব্র্যান্ডের দোকান ব্যতীত অন্য দোকানে ঠকে আসার সম্ভাবনা থাকে। যাঁরাই যাবেন, যেখানেই যাবেন যাচাই-বাছাই করে পণ্য কিনলে ঠকার সম্ভাবনা কম থাকে। কোন ভাবেই দোকানদারকে বোঝানোর দরকার নেই যে আমি বাংলাদেশ থেকে কেনাকাটা করতে এসেছি। তাহলে দোকানী আপনাকে কেনাকাটা করিয়েই ছাড়বে – সে আপনার পছন্দ হোক বা না হোক।

পিনাকী দা'কে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি যাবার ইচ্ছেটা জানালাম। এই মানুষটি ‘না’ শব্দটি জানেনেই না। বললেন ‘হ্যাঁ’, স্কুটার ভাড়া করে গড়িয়াহাট থেকে ছুটলাম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি। বৃষ্টি আর রাস্তার জ্যাম। দুই মিলে দেরি হয়ে গেল। এখানে আমাদের দেশের সাথে বেশ মিল খুঁজে পেলাম। কিছুক্ষণ বৃষ্টি অমনি কলকাতার সব রাস্তা জলের তলে, আর রাস্তায় জ্যাম। ওহ, অসহ্য। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা। ঠাকুর বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে ঘন্টা খানেক পরেই। অর্থাৎ ৫ টায় গেট বন্ধ।

তারপর কোন রকমে পৌঁছে প্রবেশ টিকিট নিলাম। পাঠক আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি এখন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। পিনাকীদা বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চললেন ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহলে। আমরাও পিছু নিলাম। সবশেষে ঘরটির

দিকে প্রথমেই যাওয়া। সেদিকে রবি ঠাকুরের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ছবি, কবিতা, পৃথিবী বিখ্যাত মানুষদের সাথে কবির বৈঠকের ছবি। শেষ কক্ষগুলোর দিকে যেতেই ভাঙা দরজা, অন্ধকার কক্ষ। এটা ঠাকুর বাড়ির আঁতুরঘর। এই কক্ষেই ঠাকুর বাড়ির সব বাচ্চার জন্ম হয়েছে। ও কক্ষে কোনদিন আলো জ্বলেনি। তারপর একটার পর একটা কক্ষে প্রবেশ করলাম, পিনাকী দা বিরামহীন বর্ণনা দিতে লাগলেন। সবগুলো কক্ষ ঘুরে আসা মোটামুটি শেষ হয়ে আসছে। রবি ঠাকুরের শোবার ঘর, অপারেশন টেবিলের মডেল, খাবার ঘর, রান্নাঘর। মৃনালিনী দেবীর প্রিয় সব খাবারের নামের তালিকা।

রান্না ঘরের জানালা দিয়ে পিনাকী দা দেখালেন দূরে বাড়ির অন্য একটি অংশ যেখানে দর্শনার্থীদের যাওয়া নিষেধ। ঐ কক্ষগুলো কখনো খোলাও হয় না। সেকক্ষে রবি ঠাকুরের বড় বৌদি কাদম্বিনী দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তারপর রবি ঠাকুরের পড়ার কক্ষ, লেখার কক্ষ, লেখার কলম, চশমা, আরাম কেদারা। পানসী, বজরা – যে যে বাহনে তিনি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াতেন। মৃনালিনী দেবীর নয় বছর বয়সের ছবি। বাংলাদেশের গাজীপুরে প্রথম বাসর। তারপর বহুদিন শাহজাদপুর, শিলাইদহে থাকা।

প্রসঙ্গত বলছি: আপনারা নিশ্চয়ই এও জানেন রবি ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি বাংলাদেশের যশোর জেলায়। কবি জীবনের স্মৃতিগুলো থরে থরে সাজানো পুরো ঠাকুর বাড়ি জুড়ে।

রবি ঠাকুরের বহু পুরস্কার। তাঁর লেখার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ। কবির বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ছবি। পৃথিবী বিখ্যাত মানুষদের সাথে সখ্য, আলোচনা, সেমিনার, বক্তৃতার ছবি শোভা পাচ্ছে ঠাকুর বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে। ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষেধ। তাই মনের আয়নায় ছবি তুলে নিলাম। কবির লেখা কবিতাগুলো চীন ও জাপানি ভাষায় অনুবাদ করে প্রদর্শন করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলা ও ভিনদেশি ভাষায়ও। প্রতিদিন নানা দেশ থেকে দর্শনার্থী এসে ভীড় করে ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়। কবির ব্যবহৃত জিপগাড়িটি আজও তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে। আছে নাটকের মঞ্চসহ নানান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। সুসজ্জিত পাঠাগার, যাদুঘর সবই আছে। পুরো বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের গান ভেসে আসে কানে, যা আপনাকে প্রাণবন্ত রাখবে।

আবারও মুগ্ধ হলাম পিনাকী দাদার অবিরাম বর্ণনা শুনে। নিজেকেই প্রশ্ন করি একজন মানুষ এতো কিছু কীভাবে জানেন? আজও রহস্য উদঘাটন করতে পারিনি।

ঠাকুর বাড়ির দারোয়ানকে বিশেষ অনুরোধ করে রবি ঠাকুরের আবক্ষমূর্তির সামনে ছবি তোলার অনুমতি পেলাম। রবি ঠাকুরের প্রতিটি ঘর, কক্ষ গবেষণা করার মতো। ঘন্টা খানেকের মতো যুদ্ধ করে ফিরছি, পিনাকীদা ডাকলেন, "শিশির ভাই এদিকে আসেন।" এগুতেই দেখি মার্বেল হাউজ। বৃষ্টির জল রাস্তায় তাই ভেতরে যেতে পারিনি। দূর থেকে দেখেছি।

অভিজ্ঞতা

মার্বেল হাউজ ভারতীয় উপমহাদেশের একটি ঐতিহাসিক বাড়ি। এখানে এশিয়ার প্রথম চিড়িয়াখানা ছিল। এখনো আছে, তবে একটু ছোট পরিসরে। এক সময় এই বাড়িতে হাজারো মানুষ মাগনা খেত। এখনো কয়েকশ মানুষ বিনে পয়সায় খায়। হোটেলে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা।

নানা অভিজ্ঞতায় ভান্ডার পূর্ণ হল। বুঝলাম পিনাকী দা ভারতের একজন চলমান ইতিহাস। এপার বাংলা ওপার বাংলার মানুষ সমান ভাবে ওনাকে ভালোবাসে। ভ্রমণ মনের চোখ খুলে দেয়। জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে। তাই ভ্রমণ করুন। পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করুন। বৈচিত্রময় সৃষ্টির নানা সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহযাত্রী হোন। ■

শুধুই আমার মা

হাজেরা বেগম

মা ওগো,আমার মা শোন—-
মা আমি কি তোমাকে বলেছি!
তোমার প্রেরণা আর আশীর্বাদে,
আমার জীবনে তুমি কতটুকু?
না, আমি কি তোমাকে বলেছি?
তুমি ছাড়া আমার এই জীবন শূন্য
আমার জীবনে শুধু তুমি অনন্য।
মা, আমি কি তোমাকে বলেছি?
পুরো পৃথিবী একদিকে আর তুমি
আমার জীবনে “মা তুমিই” পৃথিবী।
মা, আমি কি তোমাকে বলেছি?
জীবন সংগ্রামে যদি যাই হারিয়ে কভু
সত্যি হারাই, ফেলোনা চোখের জল তবু।
মা আমি কি তোমাকে বলেছি?
তুমিই আমার সাহসের চোখের আলো
তুমি ছাড়া আজও অন্ধকারে ভয় পাই
মা, আমি কি তোমাকে বলেছি?
ঘুম আসে না মাঝরাত অবধি

মাতৃদিবস

তুমি নাই তাই গল্প করার কেউ নাই
মা, আমি কি তোমাকে বলেছি?
সারারাত তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি
আজও তোমাকে মনে করে প্রার্থনা করি
মা, আমি কি তোমাকে বলেছি?
এই জগত সংসারে আমি শুধুই তোমার
এই আমি শুধুই তোমার মেয়ে-তোমারই
মা, তুমি ছাড়া আর কেহ নয় সেরা।
জগত সংসারে তোমার মত হয় না কেউ
তুমিই এ বিশ্বের বিস্ময়,
শুধুই আমার মা। ■

গুঞ্জনের আগামী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

- জুন ২০২০ ☞ বাদল সংখ্যা
- জুলাই ২০২০ ☞ মৈত্রী সংখ্যা
- অগাস্ট ২০২০ ☞ স্বতন্ত্রতা সংখ্যা
- সেপ্টেম্বর ২০২০ ☞ নৈতিকতা সংখ্যা
- অক্টোবার ২০২০ ☞ শিক্ষণ সংখ্যা
- নভেম্বর ২০২০ ☞ শিশু সংখ্যা
- ডিসেম্বর ২০২০ ☞ মানবাধিকার সংখ্যা

* বিশেষ কারণে সম্পাদক মণ্ডলী নির্ধারিত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করতে পারেন।

শেষ উপহার

স্বাগতা পাঠক

আজ ১০ই মে রূপার জন্মদিন। আজকের দিনে মা ওকে ওর পছন্দের খাবারগুলো রান্না করে দিত। জানলার গ্রীলে মাথা ঠেকিয়ে তপ্ত দুপুরে বাড়ির পেছন দিকের মাঠের পাশের জামরুল গাছটার দিকে তাকিয়ে মায়ের কথা ভাবছিল রূপা। নিজের অজান্তেই দু'ফোঁটা জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল তার।

আজ ২৩ দিন হলো মা মারা গেছে। ব্রেনস্ট্রোক হয়েছিল, হসপিটাল নিয়ে যাওয়ার সুযোগ অবধি দেইনি, তার আগেই...

হঠাৎ বাইরে কার ডাক শুনে, চোখ মুছে উঠে গেল সে। একটা অল্প বয়েসি ছেলে। হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে, আচ্ছা এটা রূপা দাসের বাড়ি?

— হ্যাঁ, আমি রূপা দাস।

প্যাকেটটা হাতে দিয়ে, এই নিন এটা আপনার জন্য এই পার্সেলটা এসেছে, আর এইখানে একটা সই করে দিন।

— কি এটা?

— সেটা তো জানি না, তবে আজ এইটা ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল।

মাতৃদিবস

ঘরে এসে, প্যাকেটটা খুলে রূপা অবাক হয়ে গেল, এটা তো একটা স্মার্ট ফোন – তাও কিনা দাম ৮০০০ টাকা। এতো দামী ফোন ওকে কে দিল? ভুল করে আসেনি তো! না নাম ঠিকানা তো ঠিকই আছে। তবে কি বাবা!

বাড়ি ফেরার পর বাবাকে জিজ্ঞেস করে সে নিরাশ হল। বাবা এটা কেনেনি। তবে কে? কোনো কিছু না ভেবে, প্যাকেটের গায়ে দেওয়া দোকানের ফোন নাম্বারে রূপা ফোন করলো বাবার ফোন থেকে। সমস্ত কিছু জানার পর, নির্জীব পাথরের মতো বসে পড়ল রূপা।

গত ১৭ মাস আগে থেকে এই ফোনটি ওর নামে বুক করে রেখেছিল ওর মা, এবং প্রতি মাসে টাকা দিয়ে আসত। আগের মাসেই শেষ কিস্তি শোধ হয়ে গেলেও ফোনটা উনি আনেননি। দোকানদারকে বলেছিলেন, "১০ই মে আমার মেয়ের জন্মদিন ওকে ওইদিন উপহার দেবো। তোমরা একটু আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। এতো দামী ফোন আমি তো বুঝি না যদি নিয়ে যেতে গেলে কিছু হয়..."

********৭ মাস আগে*******

"নে খাবারের উপর রাগ করিস না, কিছু খেয়ে নে।"

— না আমি কিছু খাবো না, তোমরা আমার এই সামান্য শখটুকু পূরণ করতে পারো না? কি চেয়েছি একটা সামান্য

ফোন তাও দেওয়ার ক্ষমতা নেই! সেই স্কুল পাশ করার পর বললে দেবে – এখন বলছো কলেজ শেষ হোক তারপর। আমার সব বন্ধুদের কাছে দামী স্মার্টফোন আছে। শুধু আমার কাছে নেই। আমার খুব লজ্জা লাগে ওদের সাথে মিশতে। সেটা তোমরা কি বুঝবে? কোনোদিন স্কুল কলেজের গণ্ডি পার করেছ?

— এই অভাবের সংসারে, তোর বাবার ওই রোজগার, আর আমার সামান্য মেশিন চালিয়ে উপার্জন, তোর পড়াশুনা চালাতে হিমসিম খাচ্ছি, এতো দামী ফোন কোথায় পাবো?

— হ্যাঁ সেই তো ওই একটা কথাই শুনে আসছি ছোটো থেকে অভাব আর অভাব, এতোই যখন অভাব তখন আমাকে জন্ম দিয়েছিলে কেন? যখন আমার সামান্য ইচ্ছে পূরণ করতে পারবে না।

— সন্তানের মুখে এমন কথা মাকে কতটা আঘাত করে তুই বুঝবি না রূপা। যেদিন থাকবো না সেদিন বুঝবি। কাঁদলে আর ফিরে পাবি না।

কখন যে চোখের জলে বালিশটা ভিজে গেছে সেটা রূপা বুঝতেও পারেনি। হাতে ফোনটা নিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো মায়ের হাসি মুখের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। এর মধ্যে পাশের বাড়ির, ছোটো ভাই নিলু এসে বলল, “রূপা দিদি, আজ সন্ধ্যেবেলায়

আমাদের পাড়ার ক্লাবে, Mother's day উপলক্ষে অনুষ্ঠান। আমি, কবিতা বলব, তুমি অবশ্যই আসবে কিন্তু...”

মায়ের ছবিটা বুকের মাঝে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে রূপা দরজার কাছেই বসে পড়ল। ■

ফিরিয়ে দেওয়া

অনির্বাণ বিশ্বাস

“মা তোমাকে ছেড়ে যাবো না। কিছুতেই যাবো না। আমায় ছেড়ে যেয়ো না।” স্কুলের প্রথম দিনে ম্যাডাম যখন স্কুলের ভেতর জোর করে বিল্টুকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, বিল্টুর সেই কান্নার কথা মনে পড়ে গেল বিধূমুখীর। সেদিন ম্যাডামের ধমক খেয়ে, বিল্টুর কান্না উপেক্ষা করেই তিনি চলে এসেছিলেন।

আজ সেই পাপেই হয়তো এতটা নির্দয় হয়ে, বিধবা মায়ের কান্নাও উপেক্ষা করে বিল্টু চলে গেল। চোখের জল মুছে সামনে বিধুমুখী তাকিয়ে দেখলেন, “সারদা বৃদ্ধাশ্রম অফিস।” ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

রত্নগর্ভার রত্ন

রাখী ভৌমিক

আর্মির চাকরিতে জয়েন করার আগে, ভারত মাতার কোলে শায়িত শহীদ আব্বার কবরে আম্মাকে নিয়ে দোয়া নিতে গেল সাবির। কার্গিলের সেই ভয়ানক যুদ্ধের পরিণাম কেড়ে নিয়েছিল তার আব্বার প্রাণ। সেদিনই সাবিরের আম্মা জাহানারা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, পেটে যে আছে তাকেও তিনি দেশ সেবাতেই নিযুক্ত করবেন।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরার বুকে আর একজন বীরকে পুনঃস্থাপন করতে হবে ভারত মাতার সেবায়। আজ জাহানারার সেই মন্ত্র পূর্ণ হয়েছে। জন্ম দিয়েছেন তিনি এক পুত্রের, যে আজ আর্মিতে নিযুক্ত হয়ে চলেছে দেশমাতার সেবাতে।

ভারতমাতার মাটি কপালে লাগিয়ে বাবার কবরে স্যালুট করে সাবির আলি চিৎকার করে বলে উঠল, 'জয় হিন্দ।' ওদিকে তখন এক রত্নগর্ভা মায়ের বুক গর্বে কেবল ফুলে ফুলে উঠছিল – আরেক মা অর্থাৎ দেশমাতার কোলে এক বীরপুত্রকে দান করবার খুশিতে। ■

মায়ের স্মৃতি

দোলা ভট্টাচার্য

ক্লাস সেভেনে পড়ি। মায়ের খুব অসুখ করেছিল তখন। ডাক্তার বলেছেন হাসপাতালে ভর্তি করতে। মা হাসপাতালে যাবার আগের দিন – সেদিন আর মায়ের ওঠার ক্ষমতা ছিল না। বড় জেঠিমা এসে বলে গেল আমাকে, বাবাকে আর ভাইকে কাছে পাঠিয়ে দিস। ওরা ওখানেই খাবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আর আমি! রুক্ষ স্বরে জেঠিমা বললেন, তোর লজ্জা করে না! তোরই তো এখন বাপ ভাইকে রেঁধে খাওয়ানোর কথা। মনে পড়ল আগের দিন রাতেও বাবাই রান্না করে আমাদের এবং মাকে খাইয়েছিল।

আজও মনে পড়ে, ওইরকম অসুস্থ অবস্থায়, রান্নাঘরে গিয়ে সেদ্ধ ভাত রেঁধে আমাকে খাইয়েছিল মা। খেতে পারিনি। শুধু কেঁদেছিলাম। সেদিন জেঠিমা চলে যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন, এখনও তো শিখলি না কিছু, মায়ের তো সময় হয়ে এল। এবার কি করবি? কথাগুলো মনে পড়ছে বারবার। ■

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

মহাপাতক

সুভাষ মুখার্জী (নীলকন্ঠ)

ডিডিং কাম হিয়ার। রোজ মোবাইল নেওয়ার জন্য বায়না করো, এসো আজ আমিই তোমাকে স্টোরি দেখাবো। কাল মাদার্স ডে। স্কুলে আস্ক করলে তুমি তো আনসার দিতে পারবে, তাই না? আজ খানিকট লার্ন করে নাও। এসো এসো, কুইক।

মম, তুমি ওটা সেভ করে রাখো, এখন আমি খেলছি। মায়ের ডাক উপেক্ষা করে খুদেটা বার্বি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এবার নিশ্চয়ই মম জোর করে টেনে নিয়ে যাবে! পাশের ডাইনিং থেকে ঠাকুরমা সঞ্চারী দেবী ভীত হলেন। তাড়াতাড়ি নাতনিকে নিজের কাছে ডাকলেন তিনি। গলা চড়িয়ে বৌমাকে বললেন, "ও আমার কাছে এসেছে মলি। একটু পরে পাঠাচ্ছি।" তিনি জানেন এবার মলি আর নাতনির উপর রাগ করবে না।

তাঁর বৌমা মেয়ে ভালো। তাঁর প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা দুটোই আছে। কিন্তু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতে গিয়ে শ্বাশুড়ীর অপছন্দের অনেক কিছুই তাকে করতে হয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নাতনির এই আধা বাংলা, আধা ইংরাজি শিক্ষা পদ্ধতি। আর সেই বা কি করে? এ

ছাড়া গতিও নেই। বাচ্চা নাকি তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে না। স্কুলের কড়া নির্দেশ। সঞ্চারী বোঝেন সব। তিনিও মেনে নিচ্ছেন বাধ্য হয়ে। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন নাতনিকে নিজের মাতৃভাষা আর সেই ধনভান্ডারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার।

ডিডিংএর ভালো নাম মৌপিয়া। সে এলে কোলে বসিয়ে আদর করেন ঠাম্মা। এসো দিদিভাই, তোমাকে বরং আমিই একটা গল্প শোনাই। আজ এক মা আর তার ছোট ছেলের গল্প বলব তোমাকে।

ঠাম্মার মুখে গল্প শুনতে মেয়েটা খুবই ভালোবাসে। এসব নেটে তেমন পাওয়া যায় না। পাপা বলে, "তোর ঠাম্মির যে গুগলবাবার চেয়ে বয়স বেশি। মনে রাখবি যা ঠাম্মি জানে তা 'উইকি'ও জানে না।"

সে গুটিশুটি মেরে কোলে বসলো। সঞ্চারী 'মা'এর উপরেই কিছু বলবেন ঠিক করেছেন। তার আগে সেই সম্পর্কিত শেখানো কথাগুলো নাতনির মনে আছে কিনা একবার ঝালিয়ে নেন।

– আগে বলোতো সেদিন মা সম্পর্কে কি বলেছিলাম?

– কোন দিন?

– সেই যে যেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

– বিদ্যুৎ মানে কি?

– লাইটনিং।

– ওওওও মনে আছে।

– কি বলো?

– মা সব সময় ছেলেমেয়ের ভালো চায়। আর... আর... কখনও মাকে হার্ট করতে নেই।

– আবার খিচুড়ি! ঠিক করে বলো।

– কপট রাগ দেখান ঠাকুরমা। নাতনি শুধরে নেয় ...কষ্ট দিতে নেই।

বেশ। এবার তোমায় এক ছেলের গল্প বলছি শোনো। নিজের মা'কে বাঁচাতে সব দেবতাদের সে একা যুদ্ধ করে হারিয়ে দিয়েছিল। সে এক বিরাট বড়ো পাখি। তার নাম ছিল গরুড়... শুরুতেই কৌতুহলের মোড় ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে যায় নাতনি, “ও পুরাণের গল্প? আগে সেই স্টোরিটা শেষ করো, সবে তো শুরু করেছিলে!”

সঞ্চারীর মনে পড়ে। সেদিন বিষ্ণুর অবতারদের কথা বলছিলেন তাকে। নাতনি মনে রাখে খুব। ফের বলে, সেই যে নারায়ণ বার বার অ্যাভেটার নিয়ে পৃথিবীতে আসে আর দুষ্টু লোকদের ঢিসাম দিয়ে চলে যায়...

হ্যাঁ সোনা, যান তো। আর শুধু তাই নয়। অনেকদিন পর আবারও তিনি একবার আসবেন। আগে থেকে বলে গিয়েছেন। আর একবার তো ফিরেই যান নি। অমর হয়ে তিন ভুবনেই রয়ে গিয়েছেন। শেষের অংশটা মনে ধরলো মেয়ের।

হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই... যে মরে যায়নি, তার স্টোরিটা বলো। কত্ত পাওয়ার!

তাঁর নাম ভগবান রাম। তিনি হাতে এক ভীষন পরশু মানে তোর অ্যাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, তাই নাম হয়েছিল পরশুরাম। তাঁর প্রচন্ড রাগ ছিল। শোন তবে সেই গল্প...ডিডিং টানটান হয়ে বসে।

সেই পরশু মানে চলতি কথায় কুঠারটা শুরুতে তাঁর হাতে আটকিয়ে গিয়েছিল। বহু তীর্থে ঘুরে তাঁকে সেটা ছাড়াতে হয়।

কেন? আটকে গেল কেন? ম্যাজিক্যাল অ্যাক্স নাকি?

না রে, উনি একবার বাবার আদেশ পালন করতে গিয়ে নিজের মা'কে সেই কুড়ুল দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। সাথে সাথেই অবশ্য বাবার কাছে মা'কে বাঁচানোর বর চান। মা বেঁচেও যায়। কিন্তু তাতেই ওই বিপত্তি। এত সব কথা মেয়ে শুনছেই না। কথা বলবার জন্য হাঁকপাঁক করছে। সুযোগ পেতেই... বাবা কেন মা'কে মেরে ফেলতে বললো? মাটা দুষ্টু ছিল?

না না। এমনিই রাগারাগি হয়েছিল। পরে আবার বাঁচিয়ে দিল তো! বুঝতে পারছেন ঘটনাটা শিশুমনে ছাপ ফেলেছে। কথা ঢাকবার চেষ্টা করছেন, আর আসলে তো বাবা মা মিলে ছেলের পরীক্ষা নিচ্ছিলো। ছেলে মা'কে বাঁচিয়ে নেওয়ায় দুজনেই কত খুশি হল...

এসব বাজে কথা। ওই ক্রাইম করবার জন্যই ওর হাতে অ্যাক্স আটকে গিয়েছিল। মা'কে কখনোই কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। দুষ্টু দেবতা...এইজন্যই ও ইমমর্টাল। লোকেদের প্রোটেক্ট করবার জন্য নয়, নিজের পানিশমেন্টের জন্য।

মেয়েটার মূর্তি অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। শেষের কথাগুলোতে সঞ্চারী বিস্মিত হয়ে গিয়েছেন। অনেকদিন আগে তিনি ওকে চিরঞ্জীবীদের গল্পও শুনিয়েছিলেন। সেখানে অশ্বত্থামার কথা বলতে বলতে কোনো কারণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। অমরত্ব আশীর্বাদ না অভিশাপ, সে সম্পর্কে গুরুগম্ভীর তত্ত্ব বোঝাতে শুরু করেন তাকে। শেষে হুস ফিরলে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলেছিলেন। ভেবেছিলেন অত খটোমটো কথা নিশ্চয়ই মাথার উপর দিয়ে বার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মেয়ে সব মনে রেখেছে! শুধু তাই নয়, বাবার আদেশ হলেও মাতৃহত্যা যে ঘৃনিত কর্ম সেটা সে দিব্যি উপলব্ধি করেছে। সেই ঘটনার সাথে অমরত্বের অভিশাপের সম্পর্কও জুড়ে নিয়েছে অদ্ভুত ভাবে। তড়িঘড়ি তিনি ফের সামাল দিতে চেষ্টা করেন, আসলে ভগবান পরশুরাম তো...

ওই জন্য শুধু ওই হেভেনে ফিরে যাওয়ার ছুটি পায় নি। এখনও আটকে আছে। নিজের মা'কে যে এমনি এমনিই মেরে ফেলে সে মোটেও ভালো নয়। ওর গল্প আমি শুনবো না।

মাতৃদিবস

ডিভান থেকে নেমে মেয়েটা মায়ের কাছে পালালো। সপ্তারী হতবাক হয়ে বসে রইলেন। দেবতার লীলা বোঝাতে না পারার অক্ষমতায় দুঃখ করবেন; নাকি সব কিছুর উপরে মায়ের গুরুত্বকে উপলব্ধি করানোর আনন্দ! কোনটার মূল্য বেশি? নাতনির জন্য গর্বে ঠাম্মার চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। ■
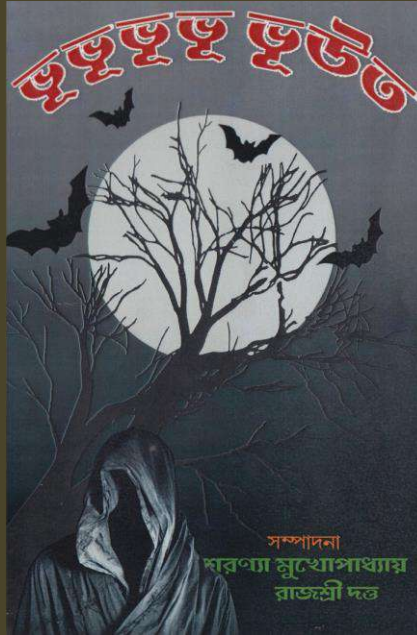
মা

পত্রালিকা বিশ্বাস

তখন কলির তিন বছর সবে, তখনও একটাও কথা ফোটেনি। অনেক ছোটাছুটি করে ডাক্তার বলেন, "মিসেস রয় এটা আপনাকে মানতে হবে, আপনার মেয়ে কোনদিনই কথা বলতে পারবেনা। আপনি শক্ত হন, না হলে কলিও ভেঙে পড়বে। ওকে একটা ভালো ডিফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুলে ভর্তি করুন।"

সেই কলিই যখন চার বছর, একদিন দীপা রান্না করতে করতে বাচ্চার গলার আওয়াজ পেয়ে ছুটে এসে দেখে ছোট্ট কলি আধো আধো গলায় 'মা মা...' বলছে। নিজের কানকে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনা দীপা, বলে আবার বল কি বললি। এবার কলি বলে 'মা।' কাঁদতে কাঁদতে কলিকে কোলে নিয়ে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেয় দীপা, মনে মনে ভাবে সার্থক তার মা হওয়া, এই ডাকের জন্যই এতকাল অপেক্ষা। তারপর কলিকে কোলে নিয়ে গাইতে থাকে, "আজকে মোদের বড়ই সুখের দিন।" ■

মাতৃদিবস

শেষ দেখা

প্রদীপ কুন্ডু

প্রতি বছর উপেন খুব সুন্দর একটা কিছু উপহার দেয় মাকে। কিন্তু বিয়ের একবছর পরই মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে এসেছে বৃদ্ধাশ্রমে। মা থাকতে চায়নি তবু জোর করে...

অনেকদিন হলো মায়ের কথা মনে পরলেও কখনও যাওয়া হয়না। মা কেমন আছে সেই খোঁজটাও...। তাই সে ঠিক করলো মাকে দেখতে যাবে মাতৃ দিবসে।

কিনে আনলো একটা খুব সুন্দর শাড়ি। মাকে উপহার দেবে। গিয়ে দেখলো মা তার জন্যে লিখে রেখে গেছে। আমি একটু ভালোবাসা চেয়েছি সারাজীবন। এই একটা দিন মা-দিবস পালন মানেই মা-দিবস নয়। তুমি ভালো থেকো। সব মা চায় তার সন্তান ভালো থাক। নিজের ভুল ভাঙলেও মায়ের সাথে শেষ দেখাটা আর হলো না উপেনের। ■

বরাবর

প্রণব কুমার বসু

ছোটবেলায় খেলতে গিয়ে পা মচকে গিয়েছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। চুন-হলুদ লাগানোর সময় দেখলাম মায়ের চোখে জল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘মা তুমি কাঁদছো কেন?’ মা উত্তরে বলেছিল, ‘ও কিছু না, ঘাম হচ্ছে।’ আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি মা আমাদের সকলকে ছেড়ে বাবার কাছে চলে গেলেন। শ্মশানে মায়ের শবদেহের পাশে আমি বসেছিলাম, সকলে এসে আমায় বলেছিল, ‘ইয়ং ছেলে তোর চোখে জল কেন?’ আমি আমার মায়ের থেকে শোনা উত্তরটাই দিয়েছিলাম, ‘ও কিছু না... ঘাম হচ্ছে।’ ■

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য কোথায় পাবেনঃ

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://ncdc.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=127&lid=432
https://news.google.com/covid19/map?hl=en-IN&gl=IN&ceid=IN:en
https://www.worldometers.info/coronavirus/

মা তোমার নেইকো তুলনা

পিয়ালী মুখার্জী

"মা ওমা কোথায় গেলে?" ওই এসে গেছে আমার মেয়ে কলেজ থেকে। যেখানে যা কাজ আছে সব ফেলে এখন তার আবদার মেটাও। একরাশ বিরক্তি নিয়ে নেমে এলাম নীচে। মেয়ের ফরমাশ মত তৈরী করতে বসলাম তার পছন্দের খাবার। খাবার বানাতে গিয়ে মনে পড়ল আমার মায়ের কথা। কত জ্বালাতন করেছি না খেয়ে, না পড়ে ... অথচ মা ঠিক আমাকে মানিয়ে নিয়ে খাইয়ে, পড়িয়ে মানুষ করেছেন। যে মেয়ে আমি কোনদিন কুটোটিও নারিনি, সেই মেয়ে আজ মা হয়ে সবার সব বায়না মিটিয়ে চলেছি। তার মানে আমার মাও তাই করে চলতেন। আমার মত কখনও বিরক্ত হতে তাঁকে দেখিনি! ■

ফাঁকি

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

প্রতি রবিবার দেখা হবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, দু’ বছর আগে মা’কে এক বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসেছিলেন ডঃ সৌম্য রায়। পসার বাড়ল, অকাজের রবিবারগুলোও উধাও হল। আজ তাঁর জন্মদিনে, সাত সকালে মা এসেছেন পায়েস নিয়ে। গল্পের ঘোরে, মায়ের কোলের অসময়ের ঘুমটা ভাঙল মোবাইলের রিঙ্গে... বৃদ্ধাশ্রম জানাল শ্রীমতী রায় আজ সকালে মারা গেছেন... ■

হতাম যদি প্রধানমন্ত্রী

সরজিৎ মণ্ডল

"হতাম যদি প্রধানমন্ত্রী" মানে...? আমি তো প্রধানমন্ত্রী হয়েইছিলাম একদিন।" গোপাল খুব সহজভাবেই কথাটা বলল। এতই সহজভাবে যে সুতপার তাক লেগে গেল।

সুতপা ওর বন্ধু গোপালের কাছে জানতে চেয়েছিল, ওকে যদি একদিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী করে দেওয়া হয়, তাহলে কী এমন দুটো কাজ আগে করবে এবং কীভাবে করবে? কিন্তু তার সে কথার পরিবর্তে ও যে এরকম উত্তর পাবে তা সে ভাবতেও পারেনি। বেশিদিন না হলেও প্রায় ছয়মাস হল তাদের কলেজের এই অদ্ভুত ছেলেটির সাথে সুতপার একটু একটু করে বেশ ভাব জমতে শুরু করেছে।

ও ভেবেছিল, গোপালকে এই প্রশ্নটা করে – তার মনোভাব বা মনের গতিবিধি জানতে পারবে, আর তাকে সেরকম বন্ধু হিসেবে বেছে নেওয়ার আগে ঠিকমতো পরখ করে নিতে পারবে। কিন্তু গোপালের এরকম উদ্ভট কথা শুনে তো ওর মাথা ঘুরে গেল। গোপাল আবার কবে দেশের প্রধানমন্ত্রী হল? ওর বয়স তো এই সবে সতেরো, ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র মাত্র। তবে সুতপা এরই মধ্যে জেনে গেছে

যে গোপাল যা বলে তা কিন্তু সরাসরি মিথ্যে নয়। হ্যাঁ, গত মাসেই তো সুতপা গোপালকে একবার বলেছিল, “তোমার সাথে আমি আইফেল টাওয়ারে চড়ে প্রেম করতে চাই। তুমি আমাকে বি এম ডবলু কার কিনে দেবে, ঘুরে বেড়াব।”

ব্যস, তারপরই গোপাল সুতপাকে টানতে টানতে স্থানীয় পার্কে নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের জন্য প্যারিসের ধাঁচে বানানো আইফেল টাওয়ারে চড়ে বসে ওকে জাপটে ধরতে গেছিল। আর সন্ধ্যেবেলায় বাচ্চাদের খেলনার দোকান থেকে বি এম ডবলু কার কিনে এনে দিয়েছিল। সুতরাং, এখন যে গোপাল সুতপাকে আবার কী বলে, কে জানে? তবে সুতপা এটুকু তো ভালোই জানে, যে, “গোপাল” বলে কোন প্রধানমন্ত্রী ভারতে এখনও পর্যন্ত হয়নি। আর তার এ বাবা গোপাল তো কখনও তা হতেই পারে না। তারপর সুতপার হঠাৎ মনে হল, গোপাল বোধহয় ভারতের ইতিহাসের প্রথম মনোনীত রাজা “গোপাল”-এর কথা বলে এবার তাকে হাঁসাবে বা ফাঁসাবে। তাই আগে ভাগেই বলে নিল, তুমি কিন্তু নিজেকে বাংলার ইতিহাসের রাজা গোপাল-এর কথা বলে আমার মাথা ধরাবে না বলে রাখছি।

– না, না, ইতিহাসে যাব কেন? আমি কি ভূত হয়ে বর্তমানে ভূতের গল্প শোনাব নাকি? তুমি ভবিষ্যতের গল্প শুনতে চেয়েছ? আর তার উত্তরে আমি যা বলেছি তা কিন্তু ঠিক।

রূপক-উদ্দীপক

সুতপা এবার কিন্তু সত্যি সত্যি পাগল হওয়ার অবস্থা প্রাপ্ত হল। তবে তার আগে ও তার এই গোপাল ভাঁড়ের ভণ্ডামিমূলক কথাবার্তা তুলে ওকেই পাগল বলতে চায়। কিন্তু কেন যেন তা বলতে পারল না। বরং উল্টে বলল, কী বলছ গোপাল? তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না?

সুতপার আশ্চর্যান্বিত প্রশ্ন শুনে গোপাল একটু মুচকি হাসল। বলল, ও তোমাকে বলা হয়নি বুঝি। ঠিক আছে আজ তাহলে বলি। কেমন?

- বলি মানে, অবশ্যই বলতে হবে। দেখি আজ আমার গোপাল ভাঁড়ের ভণ্ডামি কতটা ধারালো বা প্যাঁচালো। বাবা গোপাল, তুমি গিরিধারী গোপাল নও, যে, যা বলবে সত্য হয়ে যাবে? বল, বল, কবে তুমি প্রধানমন্ত্রী হলে?

- সে অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন ক্লাস থ্রী তে...

ব্যস, এ কথা শোনামাত্রই সুতপা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল। বলল, ও বাবা, এ যে দেখছি, সত্যি সত্যি আমাদের রাখাল নাড়ুগোপালের মতো বয়সের কথা বলে গো? বলি কেষ্টর মতো তখন থেকেই কী তোমার গোপিনী ছিল নাকি? আমি কিন্তু তাহলে... হ্যাঁ...

- না, না, রাগ করছ কেন?

- তোমার এরকম হেঁয়ালিটা এবার বাবা একটু খুলেই বল তো কলি-গোপাল... শুনে প্রাণ জুড়াক। কৌতূহল বাড়ছে,

আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে। তারপর না হয় আমার প্রশ্ন দুটোর জবাব দেবে।

- তোমার প্রশ্ন, মানে প্রধানমন্ত্রী হয়ে কি দুটো কাজ করব প্রথম। তাই তো?

- হ্যাঁ। এর মধ্যেই ভুলে গেলে নাকি?

- না, সে উত্তর আমার কাছে আছে।

- ঠিক আছে তা শুনব, তার আগে ফাঁক কেটে না বেরিয়ে আগে আমাকে বল, সেদিন কীভাবে তুমি প্রধানমন্ত্রী হলে? তোমার সেই ক্লাস থ্রী তে। হি-হি-হি করে হাসতে ইচ্ছে করছে আমার তোমার মিথ্যের বহর দেখে।

- মিথ্যে নয়। তাহলে বলি শোন...

আমি তখন খুব ছোট। আগেই বলেছি, সবে ক্লাশ থ্রী তে। হঠাৎ ক্লাসে বড় মাষ্টমশাই ঢুকে পড়েই বললেন, আজ থেকে আমরা প্রতি শ্রেনীতেই কিছু মন্ত্রী নির্বাচন করব। আমরা তো ওনার কথা শুনে, হতবাক। মাষ্টমশাইয়ের হলটা কী? বাবা তো বলে মন্ত্রী সব রাজাদের হয়। তাহলে!

সুতপা ভেবে পাচ্ছে না, কে পাগল। তার গোপাল, নাকি গোপালের মাষ্টমশাই? তবুও তা চেপে রেখে শুনতে লাগল। আর গোপালও বলে চলল।

প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, সাফাইমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর আইনমন্ত্রী একে একে সবাই নির্বাচিত হল। আমাকে করা হল প্রধানমন্ত্রী...

রূপক-উদ্দীপক

সুতপা 'থ' হয়ে শুনে চলেছে।

-শিক্ষামন্ত্রীর কাজ হল, রোজ ক্লাসে মাষ্টমশাই ঢোকার আগে ক্লাসের প্রত্যেকের কাছ থেকে হাতের লেখার খাতা যোগাড় করে টেবিলে রাখা। চক ও ডাস্টার অফিস থেকে নিয়ে এসে টেবিলে রাখা, ইত্যাদি।

না, সাফাইমন্ত্রী নিজের সাফাই গাইত না। বিদ্যালয় চত্বর পরিষ্কার আছে কি না সে ব্যাপারে তদারকি করা ছিল তার প্রধান কাজ। পরিষ্কার না থাকলে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের বলে ঝাঁটা দিয়ে সেসব জায়গা পরিষ্কার করিয়ে নিত।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাজ ছিল, প্রতিদিন ক্লাসে প্রত্যেকের মাথার চুল ঠিকমতো কাটা বা আঁচড়ানো কি না তা চেক করা। প্রত্যেকের নখ ঠিকমতো কাটা আছে কি না তা দেখা। আর দাঁত পরিষ্কার আছে কি না, কিংবা পোশাক পরিষ্কার কি না তা দেখে সেই সব কথা জানানো।

আর আইনমন্ত্রীর কাজ ছিল, কেউ ঝগড়া বা অন্যায় করলে কিংবা অনাবশ্যক কারও চুল ধরে টান দিলে বা মিথ্যে বললে তা নথিভুক্ত করে জানানো।

- কাকে জানানো?

- কাকে আবার? আমাকে জানানো। আমিই তো প্রধানমন্ত্রী ছিলাম। এই একটু আগেই তো বললাম?

- ওঃ ! বেশ ইন্টারেস্টিং ! তারপর?

- তারপর, আমি সে সব ভাল করে গুছিয়ে মাষ্টমশাইদের জানিয়ে দিতাম।

- ওরে বাবা! আমি কার সাথে কথা বলছি!

- আমার সাথে। আর প্যাঁক না দিয়ে এবার সরাসরি তোমার দুটো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শেষ করি, কেমন?

সুতপা কেমন যেন গোপালের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিল। ও ভুলেই গেল, কাল "গুঞ্জন"- ম্যাগাজিনের জন্য যে লেখা জমা দিতে হবে তার বিষয়ে, অর্থাৎ 'হতাম যদি প্রধানমন্ত্রী' লেখা জমা দেবার শেষ তারিখ আসন্ন।

গোপাল নিজে নিজেই বলে চলল।

আচ্ছা, তোমার এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমি একটা ছোট্ট গল্প বলি।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, কোন এক দেশে একবার এক ভিখিরি খাওয়ার জন্য রুটি চুরি করে – এবং তা করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে যায়। তারপর, তাকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে আসা হয়, তার শাস্তির জন্য। এ রাজা সবে নতুন নির্বাচিত হয়েছিল। তার আগের রাজার নিয়ম ছিল, চোর-জোচ্চোরদের শাস্তি হিসেবে প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করা। সবাই তাই সেই বেত্রাঘাত দেখবে বলে অপেক্ষা করছিল। ঠিক সেই সময়, সেই নতুন রাজা বেতের ছড়ি হাতে তুলে নেয় এবং হঠাৎ-ই নিজেকে মারতে শুরু করে। সবাই কেমন যেন তখন ভয় পেয়ে যায়। উপস্থিত প্রজাদের ভয় দূর

করতে গিয়ে রাজা বলে, যে দেশে এরকম ভিখিরি থাকে, তার জন্য দায়ী কে? যে দায়ী তারই শাস্তি পাওয়া উচিত। তাই আমি আমাকেই বেত্রাঘাত করলাম।

সুতপা এতক্ষণে বুঝে গেছে, একদিনের জন্য সে যদি প্রধানমন্ত্রী হয়, তাহলে এই বার্তাই সে জানাবে। অর্থাৎ, তার লেখার একটা উপাদান সে এর মধ্যেই পেয়ে গেছে। কিন্তু, তবুও গোপালকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে গেল। কারণ, ও কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওর প্রেমিকের কথাগুলো শুনছিল।

গোপাল যাতে ডিস্টার্বড ফিল না করে তাই, তাকে আর কিছু বলল না। কেবল কেমন যেন গদগদ প্রেমে তার দিকে তাকিয়েই রইল। গোপালও তা বুঝে গেছে। কিন্তু কোনরকমে নিজেকে সংযত রেখে বলল, রাণি! এবার আসি তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নে।

গোপালও যে সুতপার প্রেমে ডুবে যাচ্ছে তা সহজেই বোঝা যায়। তার অজান্তে, সুতপাকে তার 'রাণি'(!) সম্বোধনে। কিন্তু সুতপা তা বুঝল না মনে হয়। কারণ, সে বোধ হয় কেমন যেন কোন প্রেমের দেশে হারিয়ে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ ওরা দুজন কেমন যেন চুপ হয়ে গেছিল। একটু পরে সম্বিত পেয়ে গোপাল বলল, এবার তোমার দ্বিতীয় সন্ধিৎসায় আসি, কেমন?

কোন এক রাজা নাকি তাঁর দেশের প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর রাখতে রাতের বেলায় ছদ্মবেশে একা একা ঘুরে বেড়াত

তাদের বাসস্থানের রাস্তায় রাস্তায়। তারপর প্রকৃত খবর পেয়ে সেমতো ব্যবস্থা নিত তাদের দুঃখ নিবারণ করতে।

"সুতপা! প্রধানমন্ত্রী হলে, দ্বিতীয় কাজের ইঙ্গিত আমি দিয়ে দিয়েছি।" - গোপাল সুতপার চোখের সামনে আঙ্গুল নেড়ে বলল।

একটা কথা কি জান সু, একদিন প্রধানমন্ত্রী হয়ে তুমি এমন কোন কাজ করবে যা তোমাকে চিরদিনের নেতৃত্বে ধরে নিতে চাইবে। একদিনে তো তুমি ম্যাজিকের মতো প্রজাদের দুঃখ বিলীণ করে দিতে পারবে না, তবে যা করবে তা যেন নজির হয়ে যায়, মানে ট্রেন্ড বা প্রথা হয়ে যায়। ব্যস, তাহলেই দেখবে প্রজারা তোমাকে মাথা পেতে মেনে নেবে এবং একদিন না, চিরদিনের প্রধানমন্ত্রীর আসনে আসীন করে নেবে।

সুতপা যা জানতে চেয়েছিল পেয়ে গেছে। কিন্তু তার চেয়েও যা বেশি সে জেনে গেল, তা হল, "গোপাল বড় সুবোধ বালক!" সুতরাং, সেই হোক তার জীবনের চিরসাথী, চিরদিনের প্রধানমন্ত্রী বা পার্থসারথী। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান